এক

আমার ফেলে আসা দিনগুলো—'ভরা থাক স্মৃতি সুধায়'। কিন্তু সব স্মৃতিই তো সুধায় ভরে থাকেনি আমার। স্মৃতির নদীতে জাল ফেলে দেখেছি আনন্দ আর দুঃখের কত টুকরো টুকরো ঘটনা। হয়তো-বা কত স্মৃতি হারিয়েও গিয়েছে সময়ের স্রোতে—তাকে ধরে রাখার চেষ্টা কেউ করে কি? এখন জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে মনে হচ্ছে সব স্মৃতিই হারিয়ে যাবার আগে তাকে কেন না আমি কথার মালায় গেঁথে ফেলি। আমার এই স্মৃতিচারণ হয়তো-বা আমার পুত্র, আমার পুত্রবধূ, আমার ভবিষ্যৎ নাতি-নাতনির জন্য আনন্দের খোরাক হয়ে থাকবে। এই অকিঞ্চিৎকর মূল্যহীন জীবনের ঘটনাগুলো তাদের জন্য হয়তো অমূল্য হয়ে উঠবে। তখন আমার এ অনিপুণ হাতের লেখার অহেতুক প্রয়াস সার্থকতায় যাবে ভরে।

জন্ম হয়েছিল শিবসাগরে—আসামের একটা জেলা শহরে। আমার বাবা ছিলেন তখনকার দিনের বিশ্ববিখ্যাত খেতাবধারী ইঞ্জিনিয়ার—সেই সুবাদে বড়ো চাকুরেও—যাকে ব্রিটিশ আমলে বলা হত ইম্পিরিয়েল সার্ভিস। সাগর অথবা ঝিলের পারে আমাদের চমৎকার বড়ো বাংলো বাড়ি ছিল। বাবার ছিল ঘোড়ায় চড়ার শখ—আর সেই শখই হল আমাদের কাল—আনল প্রচণ্ড দুঃখ আমাদের জীবনে—আমার জন্মের অল্প দিন পরেই। শখ করে বাবা যে অস্ট্রেলিয়ান ঘোড়াটি কিনেছিলেন সেটি দেখতে নাকি বড়ো সুন্দর ছিল—গায়ের রং বাদামি আর দারুণ তেজি চেহারা ছিল তার। পায়ের খুরের কাছটা ছিল দুধের ফেনার মতো সাদা ধবধবে। তাই বাবা আদর করে তাকে ডাকতেন 'ফেনি'। ফেনিকে আমার

একেবারেই মনে নেই, কিন্তু তাকে দেখেছি আমাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে তোলা গ্রুপ ছবিতে। সবার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা খাড়াই উঁচু তার চেহারা—পিঠে সওয়ার হয়ে বসে থাকা ছোড়দা। ফেনির কথা এর বেশি আর কিছুই জানি না। কেননা আমাদের সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা জমজমাট সংগসারটি মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।

কত কথাই মনে পড়ছে—গ্রুপ ছবি তোলার প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। তখনকার দিনে সভ্রান্ত পরিবারে কিছুদিন পর পর ফোটোগ্রাফার ডেকে ছবি তোলার রেওয়াজ ছিল। আজকালকার আধুনিক লোকের মতো ঘাড়ে ক্যামেরা ঝুলিয়ে কেউ ঘুরে বেড়াত না। এখন কত আধুনিক সরঞ্জাম বেরিয়েছে—কতরকম দিশি-বিদেশি ক্যামেরা বাজারে এসেছে, যে-কোনো আনাড়িও চমৎকার ছবি তুলে নিতে পারে। আর তখনকার দিনে ফটোগ্রাফারকে রণপার মতো উঁচু একটা তেপায়া কাঠের স্ট্যান্ড নিয়ে ঘুরতে হত, সঙ্গে থাকত তাদের নিজস্ব ফটো তোলার যন্ত্র। সেই যন্ত্র অথবা ক্যামেরাটি ওই উঁচু কাঠের স্ট্যান্ডের উপর বসিয়ে তারা একটা কালো কাপড়ের ঘেরাটোপ দিয়ে মাথা ঢেকে ফোকাস ঠিক করে নিত। ফোটো তোলার দিন তার আয়োজন চলত সারাদিন ধরে। প্রথমত, সকলেই যার যার সর্বোৎকৃষ্ট জামাকাপড় পরে নিত। জামার রং গাঢ় থাকাটাই বাঞ্ছনীয় ছিল। হালকা রং-এর জামাকাপড় পরে ছবি ভালো হয় না—এই ধারণা থাকার ব্যাপারে আজকালকার আর তখনকার লোকের মধ্যে মতের কোনো পার্থক্য ছিল না। মা পরতেন গাঢ় নীল রঙের নীলাম্বরী শাড়ি। নীলাম্বরী শাড়ি পরেই সাধারণত মাকে সাজতে হত ছবি তোলার জন্য। সারি সারি চেয়ারে সবাই বসত। দাদারা সবাই পায়ে জুতো-মোজা আলপাকা কাপড়ের পোশাক পরে সেজেগুজে বসত, আর মাঝখানে বসতেন মা আর বাবা। একপ্রান্তে আমাদের ঘোড়া ফেনি—তার উপর ছোড়দা, আর অন্য কোনায় আমাদের পুরোনো ভৃত্য লক্ষ্মণ। বাবার পরনে হাফ-হাতা শার্ট, হাফপ্যান্ট—আজকাল আমরা যাকে শর্টস বলি, মাথায় শোলার টুপিটা কোলের উপর অবহেলায় রেখে দেওয়া। বাবার এই চেহারা আমি অনেক ছবিতে দেখেছি। আর মায়ের সেই শান্তশ্রীর বর্ণনা এই লেখনীতে ফুটবে কি? তার ঢলঢলে মুখে ছিল দুটি বড়ো বড়ো চোখের

অদ্ভুত শান্ত দৃষ্টি—সম্পূর্ণ মাতৃত্ব দিয়ে ভরা সেই চোখের চাউনি। মাঝখানে সিঁথি কাটা, কপালের কাছে অল্প অল্প ঢেউ তোলা চুল খোঁপায় বাঁধা। গায়ে কনুই পর্যন্ত লম্বা চৌকো গলার জ্যাকেট অথবা ব্লাউজ, গলায় লম্বা সোনার মফ চেন ঝোলানো। পায়ে থাকত হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরি বন্ধ জুতো। শুনেছি সেই জুতো জোড়া দামের দিক দিয়ে ছিল মহার্ঘ—আর গুণের দিক থেকে ছিল একেবারে তুলতুলে নরম। আজকালকার বোম্বের তাজমহল হোটেলের জয়-স্যুজ-এর জুতোকেও বোধ হয় হার মানায়। জুতো নিয়ে এই কথাগুলো লিখলাম এইজন্য যে, অসম্ভব স্পর্শকাতর আমার ডান পা, যখন থেকে ছোটোবেলায় মাত্র ছ-বছর বয়সে গাড়ির চাকা চলে গেল আমার গাড়ির উপর দিয়ে তখন থেকেই ওই পা আমার অল্প দুর্বল। অনেক ভেবেচিন্তে জুতো কিনি। মায়ের পায়ের জুতোর দিকে তাকিয়ে সবসময় ভেবেছি—আহা! ওইরকম জুতো যদি পেতাম তাহলে কিনতাম। যাক, সূর্য ডোবার আগে ছবি তোলা শেষ হয়ে যেত—কেননা যতদূর জানি ক্যামেরায় তখনও ফ্ল্যাশ লাইটের ব্যবস্থা হয়নি। মায়ের সেই অপূর্ব সুন্দর নীলাম্বরী শাড়ি—পাখির পালকের মতো কোমল রেশমের শাড়ি আমি আর একটু বড়ো হয়ে দেখেছি। ওগুলো তখন বড়ো একটা ট্রাঙ্কে থাকত—মায়ের অঙ্গে আর শোভা পেত না। অকাল বৈধব্যের জন্য মা কিন্তু এত শিক্ষিতা হয়েও নিজেকে অথবা নিজের ভাগ্যকেই দায়ী করেছিলেন। তাই নিজের উপর অকারণ নিপীড়ন, নির্যাতনের শেষ ছিল না। নির্জলা একাদশীর উপবাস, অম্বুবাচীর কঠোর নিয়মগুলো পালন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না তাঁর, যদিও তিনি ছিলেন আসলে ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে। মায়ের কথা আরও অনেক লেখার আছে, কিন্তু তা পরে। এখানে একটা সম্পূর্ণ অন্য ঘটনা মনে পড়ে গেল—মায়ের শাড়ির সঙ্গে জড়ানো ভারি সুন্দর একটা স্মৃতি আমার আজও মনে পড়ে। আমার ছোটোবেলায় কিছুদিন পর পর পাড়ার ছেলেদের মধ্যে থিয়েটার করার চল ছিল। পাড়ার কারুর কোনো বড়ো উঠোনে বাঁশ ইত্যাদি জোগাড় করে দিব্যি স্টেজ বানানো হত। হাল আমলের স্টেজের মতো সেগুলো এত কেতারদুরস্ত ছিল না—কিন্তু তাতে উত্তেজনা, আগ্রহের কিছু ঘাটতি হত না। শিল্পীরা যারা নাটকে পার্ট করত, তারা প্রাণ ঢেলে প্রচণ্ড খেটে

অনেকটা আজকাল যেমন ছেলেরা মধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিকের পড়া মুখস্থ করে—তেমনি যার যার পার্ট মুখস্থ করত। দিনের পর দিন চলত রিহার্সালের পালা। চন্দ্রগুপ্ত, রাজা হরিশচন্দ্র, কর্ণার্জুন ইত্যাদি ধরণের নাটক এবং কিছু কিছু রবীন্দ্রনাথের ছোটো নাটিকা সকলের মনোগ্রাহী ছিল। নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগে তার আবশ্যকীয় জিনিসের জন্য যার যার বাড়িতে হামলা দিয়ে তা জোগাড় করা হত—স্ত্রী ভূমিকার জন্য পরচুলোর দরকার হত। ওগুলো বোধ হয় বাজারেই পাওয়া যেত। তা ছাড়া তখনকার দিনে পরচুলো অথবা আধুনিক ভাষায় আমরা যাকে উইগ বলি, তা কোনো বাড়িতেই থাকত না। সুতরাং সেগুলোর জন্য আমাদের বাড়িতে কাউকে কখনো আসতে দেখিনি। যে একটা 'অমূল্য' জিনিসের জন্য ওরা মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়িতে হানা দিত সেটা ছিল মায়ের একটা শাড়ি—সমুদ্রের নীল রং-এর মতো ছিল সেই শাড়ির রং। সুতরাং স্টেজে নদীর জল দেখাবার জন্য সেই শাড়ির চাহিদা কিছু অগ্রাহ্যের ছিল না। জল কীভাবে দেখানো হবে তার মহড়া আমাদের বাড়িতেই হত, আর আমি হাঁ করে তাকিয়ে অবাক হয়ে ওই মহড়াটা দেখতাম। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল আমার কাছে—কেননা আমি তো তার এতটুকু আজও ভুলিনি। চোখের সামনে এখনও তা স্পষ্ট দেখতে পাই। দু-পাশে দুটি ছেলে শাড়িটা ধরে দাঁড়াত আর উপর-নীচে নেড়ে নেড়ে তারা ঢেউ খেলাবার দৃশ্যটা আনার চেষ্টা করত। যথাসময়ে অর্থাৎ যেদিন নাটকটা মঞ্চস্থ হত সেদিনও আমি সেই জলের ঢেউয়ের দৃশ্য দেখেছি। যদিও খুব ছোটো ছিলাম, তবুও যতদূর মনে পড়ে আমার চোখে তা ঠিক জলের ঢেউয়ের মতো মনে হয়নি। কিন্তু কল্পনার তো কোনো সীমা নেই। সুতরাং কল্পনায় রং চড়িয়ে সকলে নিশ্চয়ই তা নদীর ঢেউই দেখত। ওই দৃশ্যটি দেখার জন্য আমি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে থাকতাম—আমার ধারণা সব দর্শকই ওই দৃশ্যটা খুবই উপভোগ করত। আরও একটা দৃশ্য অত্যন্ত বিস্ময়কর ছিল আমার কাছে। অতিশয় সুন্দর সাজে সজ্জিত একটি মেয়ে আকাশ থেকে নেমে ধীরে ধীরে সকলের চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করত। ভগীরথ থেকে নেমে আসা গঙ্গার রূপে তাকে দেখানো হত। যদিও আমরা তাকে ঝুনুদি বলে জানতাম, তবুও ওই ভুবন ভোলানো

রূপে মুগ্ধ হয়ে তখন তাকে স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোনো দেবী বলেই ভাবতাম। আসলে তাকে যে দোলনা-জাতীয় একটা পিঁড়ির উপরে বসিয়ে দু-পাশে দুটি দড়ি দিয়ে ভারসাম্য রেখে আসতে আসতে তাকে নামানো হত—আমার নিতান্ত অনভিজ্ঞ চোখে তা ধরা পড়ত না। শূন্যে স্টেজের ঠিক মাঝখানে সে নিশ্চল হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত আর দর্শকদের কৌতূহলের সীমা থাকত না ওই দৃশ্যটি দেখার জন্য। এ ওর মাথার উপর দিয়ে উঁকি মেরে, এর ঘাড়ের ফাঁকে, ওর ঘাড়ের ফাঁকে চোখ রেখে দৃশ্যটা তারা কোনোরকমে দেখে নিত আর তারপরই ড্রপসিন পড়ে যেত। দর্শকদের মধ্যে হাততালির ধুম চলত কিছুক্ষণ ধরে। ওইসব পাড়ার থিয়েটারে নাচ গানেরও প্রচুর চাহিদা ছিল। বিশেষ করে মনে পড়ে যায় 'মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে' নাচটি—নানা রং-এর ওড়না পরে দলবেঁধে গান গেয়ে গেয়ে ওই নাচটি নেচেছিলাম আমরা। ভালো করে নাচ শেখার সুযোগ আমি পাইনি। গান গাওয়ার হাতখড়ি কিন্তু আমার তখনই হয়েছিল। তবে গান গাইবার সহজাত ক্ষমতা নিয়েই আমার জন্ম হয়েছিল। আমরা সব ভাই-বোনেরাই গান গাইতাম, প্রায় কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই। কারুর কারুর গলা অত্যন্ত ভালো ছিল—যেমন সেজদা। ছোটোবেলায় আমার ও আমার ছোটো ভাই-এর গানের শিক্ষা শুরু হয়েছিল ওঁর কাছেই। বাবা বেঁচে থাকতে সেজদাকে নাকি লুকিয়ে গাইতে হত, একথা মায়ের মুখে পরে শুনেছি। গানবাজনা করলে ছেলের লেখাপড়া হবে না, ইঞ্জিনিয়ার হবে না এই ধারণা বাবার বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু বাবা তো আমরা বড়ো হওয়ার আগেই উধাও হয়ে গেলেন। আর আমাদের গানবাজনাও তাই চলল অগাধ নিষ্ঠায়। পাড়ার থিয়েটারের কথা লিখতে গিয়ে অন্য আর একটা কথা মনে হল। একটা ঘটনা আমার শিশু বয়সে যে বেদনার ছাপ ফেলেছিল আজও তা আমার মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। থিয়েটার হবে শিগগিরই আর তার জোর মহড়া চলছিল ক-দিন ধরে। নাটক ধার্য হয়েছিল যতদূর মনে হয় 'মেবার পতন' আর তাতে ছোড়দার একটা গান ছিল—'এ পথ গেছে কোনখানে গো'। একটু রাত্তির করে থিয়েটার হত। বাড়ির মেয়েরা খাওয়া-দাওয়ার পর কাজ কর্ম সেরে থিয়েটার দেখতে যেতেন। আমি সন্ধ্যার সময় বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিশ্চিন্ত

মনে সকলের ব্যস্ততা দেখতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ঘুমে চোখ জড়িয়ে যাচ্ছিল কিন্তু জোর করে তা আটকে রাখার চেষ্টা করছিলাম, কেননা খানিকক্ষণ পরই তো থিয়েটার দেখতে যেতে হবে। জেগেই আছি আর জেগেই থাকব এই ছিল ধারণা—কিন্তু প্রতারক ঘুম আমার চোখে এমন করে চেপে এল যে, আমি সব ভুলে গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম। রাত তখন কত হবে জানি না—হঠাৎ ধড়মড় করে আমার ঘুম ভেঙে গেল। একটু কমিয়ে রাখা লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম নীচে লক্ষ্মণ শুয়ে আছে। আমি জেগে উঠেই 'মা মা' বলে কাঁদতে লাগলাম। দূরে গানবাজনার বিশেষ করে ছোড়দার গানের যেন ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার এক নাগাড়ে কান্নার শব্দে লক্ষ্মণের ঘুম গেল ভেঙে। 'খুকিসোনা কাঁদে না, কাঁদে না' বলে ও আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগল। কিন্তু কে শোনে কার কথা, আমি তো কেঁদেই চলেছি। অনেক রাত্তিরে হই-হই করে ফিরে এল সকলেই আর আমার কান্না দেখে চলল আমাকে অহেতুক সান্ত্বনা দেবার পালা। সকাল হল আর শুরু হল আবার আমার কান্না। দাদা একজন আমায় কোলে করে বেশ খানিকটা বেড়িয়ে নিয়ে এল। আমায় আশ্বাস দেওয়া হল শিগগিরই আবার নাকি থিয়েটার হবে আর এবারে অবশ্যই আমি তা দেখব। কিন্তু থিয়েটারটা আর হল না আর আমার মনের মধ্যে ওটা না দেখার দুঃখটা কাঁটার খোঁচার মতো হয়ে রইল অনেকদিন।